সভ্যতার সংঘাত

মুস্তফা হুসাইন

আদিকাল থেকেই দুনিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলো অনুগত বা মিত্রভাবাপন্ন শাসকদের মাধ্যমে কেন্দ্রের বাইরের রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের ক্ষমতার বলয় ব্যাপৃত করে আসছে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে যে সাধারণ সমস্যাগুলো (যেমন : স্থানীয়দের প্রতিরোধ, প্রশাসনিক ব্যায়, ব্যাবস্থাপনাগত জটিলতা ইত্যাদি) হয়ে থাকে, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর সম্পদ ও সমর্থন থেকে পরাশক্তিগুলো নিজেদের পরিপুষ্ট করে থাকে। তাই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা কলোনি স্থাপনের বদলে পরাশক্তির অধিক পছন্দনীয় হলো—অনুগত দালাল সরকার বা নিদেনপক্ষে ‘মিত্রভাবাপন্ন’ সরকার। এতে করে নামমাত্র দর-কষাকষির মাধ্যমেই পরাশক্তিগুলো নিজেদের প্রয়োজনীয় ফায়দা হাসিল করতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবেই বিশ্বব্যাবস্থা বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হলেও, পরাশক্তির দাপট চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর। যখন প্রায় গোটা দুনিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নের্তৃত্বে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও ওয়ারশ জোট, অপরটি ছিল আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের অধীনে। জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পালাবদলের কারণে দেশীয় আন্দোলনগুলোর জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা রাখা সে সময়ে ছিল সবচেয়ে কঠিন। কেননা তখন শুধু স্থানীয় শাসকদের অপসারণ চাইলেই হতো না। বরং, স্থানীয় শাসকদের প্রভুর অতিকায় শক্তির মোকাবিলাও করতে হতো।

আর পরাশক্তিগুলো নিজেদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা অধিভুক্ত দেশগুলোতে ধরে রাখতে অনিবার্যভাবেই আদর্শিক আগ্রাসন চালাতে বাধ্য হয়। যার ফলে পরাশক্তিগুলো দিনশেষে একেকটি সভ্যতার জন্মদান করে। তাই আমরা দেখি যে, প্রতিটি পরাশক্তি বা সাম্রাজ্য ও তার অনুগামী ছোট ছোট জাতিগুলো সাধারণত ঐক্যবদ্ধ হয় একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাকাঠামো, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বা আদর্শিক ভিত্তির আলোকে। যার ফলে তৈরি হয় নতুন সভ্যতা।

ইতিপূর্বে দুনিয়াকে যেমন- খ্রিস্টিয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা নের্তৃত্ব দিয়েছে, একইভাবে আধুনিক সময়ে পশ্চিমা লিবারেল সভ্যতা বা কমিউনিস্ট সভ্যতাকেও আধিপত্য করতে আমরা দেখেছি। প্রতিটি সভ্যতার উত্থান-পতনের গল্প আল্লাহ তা আলার এক অমোঘ নীতি মোতাবেকই সংঘটিত হয়ে আসছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমেরিকান, ফরাসি, বলশেভিক বিপ্লবের পর- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দুনিয়া চারটি আদর্শের সংঘাত দেখতে পায়- লিবারেলিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম এবং ইসলাম।

ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী উসমানী সাম্রাজ্য এবং ফ্যাসিবাদি সভ্যতার কেন্দ্র জার্মান সাম্রাজ্য সামরিক ময়দানে পরাজিত হওয়ার ফলে- গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মাঝে বন্টিত হয়। আর ইতিহাসের নিয়মানুযায়ীই, পরাশক্তি আমেরিকা নিজ স্যাটেলাইট রাষ্ট্রগুলোতে লিবারেলিজম এবং অপর পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া নিজ অক্ষভুক্ত দেশগুলোতে কমিউনিজমের বিষ ছড়িয়ে দেয়।

আল্লাহর ইচ্ছায় আদর্শিক দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা ঈমানদাররা দুই পরাশক্তির খেলনায় পরিণত হওয়া ভারসাম্যহীন দুনিয়াকে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ফলে স্থানীয়ভাবে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পথ অনেকটাই সুগম হয়। কেননা, নিজ ভূমি থেকে দূরের দেশগুলোতে স্থানীয় দালালদের টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা পরাশক্তিগুলোর আর নেই। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমেরিকা ও রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। দ্বি-এককেন্দ্রিকতা ও এককেন্দ্রিকতার পর বিশ্ব রাজনীতি আবার বহুকেন্দ্রিক অবস্থায় ফিরে গেছে।

তবে, সফল ইসলামী আন্দোলনের জন্য শীতল যুদ্ধকালীন দুনিয়ার বাস্তবতা এবং পরাশক্তির কর্মপদ্ধতি জানা আমাদের জন্য আবশ্যক। ওই সময়কার পরাশক্তিদের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত জানা গেলে বর্তমান আমেরিকা, চীন, রাশিয়া বা ভারতের মতো তুলনামূলক দুর্বল শক্তির ভয় অনেকটাই কেটে যাবে। আর স্থানীয়ভাবে সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে আঁকড়ে ধরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে সেক্যুলার শাসনের কুফর ও জুলুম থেকে ইসলামী শাসনের ইনসাফ ও আদলে ফিরিয়ে আনা যাবে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ হলো জাতিসংঘ। এর ভেতরের আসল রূপটি হলো দুই পরাশক্তির অধীনে দুটি মেরু। এ দুই পরাশক্তি ছিল আমেরিকা-USA, সোভিয়েত রাশিয়া (USSR)। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোট নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই দুই মেরু। যেভাবে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ আবর্তন করে, তেমনিভাবে এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো বিভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্রগুলো।

পরাশক্তির আনুগত্যের বিনিময়ে গোলাম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পেত। তবে এই সাহায্য ছিল খুবই সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো যেত কিছু নির্দিষ্ট মানুষের পকেটে। ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী নেতা কিংবা শক্তিশালী সামরিক কমান্ডাররা এগুলো ভোগ করত। কিছুদিন এই অবস্থা চলল।

তারপর কিছু কিছু সরকারের পতন ঘটল। তাদের জায়গায় আসলো নতুন সরকার। এ উত্থান-পতনের ব্যাপারটা ঘটত এভাবে—ওই সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে ছিল, সেই পরাশক্তি তার সমর্থন সরিয়ে নিল। কিংবা পরাশক্তির ইচ্ছা থাকলেও উক্ত সরকারের পতন ঠেকাতে পারল না। অথবা অপর পরাশক্তি সরকার-বিরোধী কোনো দলকে ক্ষমতাসীনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করিয়ে বা অন্য কোনোভাবে (বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে) সরকারের পতন ঘটিয়ে তার জায়গা দখল করতে সাহায্য করল।

যেসব শাসকগোষ্ঠী স্থিতিশীল হতে পারল, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। ক্ষমতাসীন সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে অবস্থান নিল, সেই পরাশক্তির চিন্তা-চেতনার সাথে নিজেদেরটাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। এই সব মূল্যবোধ যতোই অযৌক্তিক কিংবা সুস্থ বিচারবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন, ক্ষমতাসীনরা এগুলোকে উপস্থাপন করলো মহিমান্বিত হিসাবে। এই সরকারগুলো তাদের শাসনাধীন সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে শুরু করল। কালের পরিক্রমায় তারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করে নষ্ট করে দিল। ফলে মানুষের মাঝে অন্যায়-অবিচার-অপরাধ বেড়ে গেল।

৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশে গঠনের মধ্যে এই পুরো কাঠামোর বাস্তবতা দেখা যায়। ওই সময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছিল আমেরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ভারত ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে। এদেশের বিভিন্ন নেতাকে ভারত তখন সমর্থন দিয়েছিল। এতে ছিল সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ মদদ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারন করা হয়, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, এবং গণতন্ত্র। যদিও এই দর্শনগুলোর সাথে বাংলার আমজনতার কোন পরিচয় ছিল না, সমর্থনও ছিল না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জান-মাল-সম্মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সেক্যুলার এলিটরা এই সংবিধানকে বাংলার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়।

একইভাবে পরাশক্তির সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনা মিশিয়ে এক মিশ্রিত মূল্যবোধকে 'হাজার বছরে চেতনা' নামে চাপিয়ে দেয়। আদতে তা ছিল শিরক-প্রভাবিত এবং কট্টরভাবে ইসলামবিরোধী।

এই দুই পরাশক্তি বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মাধ্যমে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রবল সামরিক শক্তি। যা পরাশক্তির কেন্দ্র থেকে শুরু করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা দেশগুলোর ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। আত্মসমর্পণ করা ভূখন্ডগুলো হলো ঐসব অঞ্চল, যারা পরাশক্তির কেন্দ্রের প্রতি অনুগত। তার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা মেনে নিতে বাধ্য এবং তার স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ।

এই দুই পরাশক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা সুবিশাল। তবে বিশুদ্ধ মানবিক বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এই পরাশক্তিগুলো যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, কেবল নিজস্ব শক্তি দিয়ে, নিজ রাষ্ট্রে বসে (অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে) দূরবর্তী কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা টিকিয়ে রাখতে তারা সক্ষম ছিল না। যেমন, মিশর কিংবা ইয়েমেনের কথা বলা যায়। এইসব দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখা আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার পক্ষে এককভাবে সম্ভব ছিল না।

পরাশক্তিগুলো ছিল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের ওপর চেপে বসা শাসকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক শক্তি। যারা পরাশক্তির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছিল। এসবই সত্য। কিন্তু তবু এই শক্তি একটি ভূখণ্ডকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রনের জন্য যথেষ্ট না। এ কারণে পরাশক্তিগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে এক প্রতারণাপূর্ণ মায়াজাল তৈরি করে। মিডিয়া পরাশক্তির ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বব্যাপী হিসাবে। এমন শক্তি, যা কিনা আসমান-জমিনের উপর কর্তৃত্ব রাখে, যেন সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার মতোই তাদের ক্ষমতা!

মিডিয়ার মায়াজাল বিশ্ববাসীকে বোঝায়—পরাশক্তিগুলো অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী। তাই মানুষ যেন স্বেচ্ছায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেন তাদেরকে ভালোও বাসে। কারণ তারা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবতার স্লোগান নিয়ে হাজির হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, নিজেদের সৃষ্ট এইসব প্রপাগান্ডাকে পরাশক্তিরাও বিশ্বাস করে বসেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিল সত্যিই বুঝি তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা বিশ্বের কোনো স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম! কোনো রাষ্ট্র যখন এই কাল্পনিক শক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, এবং সেই মোতাবেক আচরণ করতে থাকে, তখন তার পতনের পালা শুরু হয়। পরাশক্তিগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তারা তাদের মিডিয়ার প্রচারণাকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। নিজেদের বানানো মায়াজালে নিজেরাই জড়িয়ে গেছে।

আমেরিকান লেখক পল কেনেডি ঠিক যেমনটি বলেছেন,

'আমেরিকা যদি তার সামরিক শকিতর বযবহারে অতি প্রসারতা আনে এবং কৌশলগতভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তবে এটাই তার পতন ডেকে আনবে।”

পরাশক্তিগুলোর বিপুল সামরিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে তাদের নিজ ভূখন্ডের সামাজিক সংহতি। (সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার সংহতি ও সমন্বয়) এই সংহতি ও সমন্বয় ছাড়া বিপুল পরিমাণ সামরিক শক্তি আর তথ্য-প্রযুক্তির কোনো মূল্য নেই। যদি সমাজের সংহতি ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক সত্তা ধ্বসে যায়, তাহলে এই বিপুল সামরিক শক্তিই পরাশক্তির জন্য পরিণত হতে পারে অভিশাপে।

যেসব উপাদান সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সত্তার পতন ডেকে আনতে পারে সেগুলোকে ‘সভ্যতা-বিনাশী’ বলা যায়। ধর্মীয় অবক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, বিত্ত-বৈভব, আত্মকেন্দ্রিকতা, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়া, সব কিছুর উপর দুনিয়াকে ভালোবাসা ইত্যাদি, ‘সভ্যতা বিনাশী উপাদান।

যখন কোন পরাশক্তির ভেতরে অনেকগুলো সভ্যতাবিনাশী উপাদান একসাথে দেখা দেয়, এবং একে অপরের সাথে মিলে পরস্পরকে শক্তিশালী করে, তখন ওই পরাশক্তির পতনের গতিও বেড়ে যায়। এই উপাদানগুলো সমাজে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে পারে, কিংবা সুপ্তও থাকতে পারে। তবে উপাদানগুলো পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে পরাশক্তির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পতন ঘটানোর পর্যায়ে পৌঁছাতে আরেকটি সাহায্যকারী উপাদানের প্রয়োজন।

যখন সব উপাদানের উপস্থিতি থাকে, তখন পরাশক্তি ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পতন ঘটে। সামরিকভাবে সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কেননা সামরিক ক্ষমতা ও মিডিয়ার মাধ্যমে অর্জিত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শুধু তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন কেন্দ্রে সামাজিক সংহতি ও একতা বজায় থাকে।

শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হয় দুইভাবে।

- সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে, অথবা
- (আকিদাহ কিংবা সত্যের ভিত্তিতে না হয়ে) কেবল জুলুম প্রতিহত করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। কারণ যুলুম প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা মুমিন-কাফের সবার কাছেই সমাদৃত বিষয়।

এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শরিয়াহ ও সার্বজনীন মূলনীতির আলোকে, পরাশক্তির সামাজিক সংহতি ও মিডিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে এবং ঈমান, বিপ্লব ও আত্মত্যাগের মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে, অগ্রগামী ও আত্মত্যাগী ঈমানদাররাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা দুই অতিদানবের পতন ঘটিয়েছিলেন মাত্র ৩ যুগের ব্যাবধানে!

(*আলোচনাটির মূল অংশ 'ইদারাতুত তাওয়াহহুশ"* বই থেকে গৃহীত)

[illegible]

আশির দশকে আফগান-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। দুনিয়ার পূর্ব দিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মিত্র শক্তি মিলে গঠিত হয়েছিল ‘ওয়ারশ জোট’। পশ্চিমে ছিল আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তি নিয়ে গঠিত ‘ন্যাটো জোট’। আফগানিস্তানের এই যুদ্ধ আসলে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হওয়া বিশাল একটি লড়াইকে চূড়ান্ত সমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছিল (যা স্নায়ুযুদ্ধ নামে অভিহিত ছিল)। আল্লাহর ইচ্ছায় এই যুদ্ধ ছিল স্পষ্ট বিজয় এবং বিরাট এক অলৌকিক ঘটনা। এর মাধ্যমে যুগের তাগুতি শক্তির সকল অহংকার খতম হয়েছিল।

এটা তখনকার কথা, যখন আধুনিক অস্ত্রে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। অন্যদিকে মুসলিমদের হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। তাদের শাসকরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত ছিল এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছিল; এবং জিহাদ করতে ইচ্ছুকদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

সেই সময়ে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে মজুদ ছিল অত্যাধুনিক হাজারো যুদ্ধযান ও উন্নত ট্যাংক। তাদের কাছে শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণ দ্রুত গতিসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিমান ছিল। আরও ছিল অস্ত্রে সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ সেনা। এই বিশাল রাষ্ট্রটি আফগানে সমাজতন্ত্র প্রচারের চেষ্টা করে। অতঃপর আফগান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের অনুগত কমিউনিস্ট নেতা বারবাক কারমালের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটিয়ে রাষ্ট্র দখল করে নেয়। সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে এই হিংস্র লাল বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে।

এই বিশাল ঘটনাটি তখন পুরো পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে দিয়েছিল। এই ভয়াবহ খবরটি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। আরবসহ পুরো বিশ্বে তাদের শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ভয়ংকর ঘটনাটি মূলত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ও ন্যাটো জোটের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলো। রাশিয়া যখন ইউরোপের পূর্বের অংশ দখল করে নেয়, তখন এই ন্যাটো জোট (এই জোটে আমেরিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য অধিকাংশ দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল) ইউরোপে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা অস্ত্রের পেছনে প্রায় সাড়ে চারশ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলো।

এসবই তারা করেছিল ইউরোপের উপর রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে। তারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করেছিলো, যেমনটা পূর্বে রোমানিয়াতে করেছিল। ষাটের দশকে কোনো রাষ্ট্র যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করত, তাদের শাসকরা থাকত রাশিয়ান ট্যাংকের নিচে। রাশিয়ানরা বিশাল বিমান বহর, সেনাবাহিনী ও অস্ত্র বহন করে নিয়ে আসত এবং পুরো দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিত।

একারণে সমস্ত মানুষ কমিউনিস্টদের দাসে পরিণত হয়েছিল। এই লাল দানব, হিংস্র রাশিয়ান ভাল্লুক হঠাৎ করেই ১৩৯৯ হিজরীতে তার বহর নিয়ে কাবুল দখল করে বসে। তারা এসেছিল তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কেমেনিস্তান দিয়ে। এই আগ্রাসনের ফলে রাজধানীসহ সমস্ত অঞ্চল ক্রুসেডার রাশিয়ার দখলদারিত্বের অধীনে চলে যায়।

এপর্যায়ে এসে রাশিয়ার আফগানিস্তানে প্রবেশের পূর্বের অবস্থা একটু বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক। কেন রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশ করেছিল? আফগানিস্তান কি তাদের মৌলিক কোনো স্বার্থ ছিল? নাকি মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি অন্য কোনো স্বার্থ ছিল?

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশাল বিস্তৃত এক শক্তি। আজারবাইজান, চেচনিয়া ও তার আশপাশ, তুর্কেমিনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্থান—এই সবগুলো রাষ্ট্রই সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল দানব রাষ্ট্রটি দুর্বল একটি রাষ্ট্রে প্রবেশের ফলে মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। যারা সংখ্যায়, শক্তিতে ও যুদ্ধাস্ত্রে অনেক ছোট ছিল। ১৯৭৯ সালে আফগান প্রশাসনের

সহায়তায় তারা এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এই ছোট রাষ্ট্রটির এবং রাশিয়ান বিশাল দানবের মাঝে সব বিষয়েই বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। মানুষ কল্পনাও করেনি, এই দুর্বল রাষ্ট্রটি রাশিয়াকে পরাজিত করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার ফলে শুধু পরাজিতই করেনি; বরং তাদের নিশানা পর্যন্ত জমিনের বুক থেকে মুছে দিয়েছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলো। তারা ইরাকে প্রবেশ করে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ইরাকি বাথ পার্টি মুসলিম সন্তানদেরকে কমিউনিজমের দিকে আহ্বান করতে থাকে এবং তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও নাস্তিকতা শিক্ষা দিতে থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে বাথ পার্টিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। সিরিয়াও সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে তারাও সমাজতন্ত্রকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের স্লোগান ছিল, 'ঐক্য, মুক্তি, সমাজতন্ত্র'- যা স্পষ্ট কুফর।

কমিউনিষ্ট লাল সেনারা দক্ষিণ ইয়েমেনেও প্রবেশ করে। ফলে ইয়েমেন সমাজতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে। অতঃপর সোভিয়েত জোট আরো অগ্রসর হয়ে সোমালিয়া দখল করে নেয়। এর ফলে প্রেসিডেন্ট সিয়াদ বারি-এর সময়ে সোমালিয়া কমিউনিষ্টপন্থী হয়ে যায়। যখন সে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক নীতি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তখন তার সামনে কিছু আলেম বাঁধা হয়ে দাঁড়ান। কিছু টাকা ও কয়েক লোকমা খাবারের জন্য দ্বীনের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেন। ফলে সিয়াদ বারি সেই সমস্ত আলেমকে মোগাদিশু'র একটি মাঠে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরবর্তীতে তারা মুসলিম ইরিত্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং জনতা পার্টির নামে কমিউনিজমের ধারণা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। এভাবেই কমিউনিষ্ট বাহিনী সোভিয়েত নাস্তিকতাকে বহন করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কোনো কিছুই তার সামনে বাধা হতে পারছিলো না। কোনো শক্তিই তাকে থামাতে পারছিলো না।

রাশিয়া ইউরোপের পূর্বাংশ দখলের পর ইউরোপ-আমেরিকার একমাত্র চিন্তা ছিল পূর্ব ইউরোপের প্রবেশ দ্বারে রাশিয়ান বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া। একসময় তারা জার্মানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছিল, পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানি ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে ফেলে।

নেদারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি, ইউরোপের এ সকল দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকাসহ পশ্চিমা সকল নেতাই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এই অবস্থার মধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকার জন্য একটি বিশাল ধাক্কা আসে। যেই ইথিওপিয়া কয়েক দশক ধরে খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে আসছিলো, সেটাও রাশিয়ার অধীনে পরিচালিত হওয়া শুরু করে। অবশ্য অল্প কিছু কাল মুসলিমরা সেটাকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে ধরে রেখেছিলো। ইথিওপিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হওয়া স্বত্ত্বেও তারা খ্রিষ্টানদের অধীনে রয়ে গিয়েছিল। তাদের সর্বশেষ নেতা ছিল সম্রাট হেইল সেলেসি। রাশিয়া সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয়, যারা ছিল ইথিওপিয়ার সেই সমস্ত সন্তান, যারা রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছিলো। সেখানে তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও কুফরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো।

এরপর মেনজিস্তু হাইল ফিরে এসে ইথিওপিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নেয়। এর ফলে আফ্রিকার এই বড় দেশটিও সোভিয়েত প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই বাহিনীর অগ্রযাত্রা মধ্য-আফ্রিকা ও ল্যাটিন-আমেরিকা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফিদেল কাস্ত্রোর মাধ্যমে

কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা হয় কিউবাতে। যে কিউবা ছিলো আমেরিকার সমুদ্র তীর থেকে একশ মাইলেরও কম দূরত্বে।

এভাবেই দুর্বল জাতিগুলোকে দখল করার প্রতিযোগিতা চলছিল। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছিল ও নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হচ্ছিল। যদিও তারা মুসলিম ছিল না বা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। অর্থাৎ কোনো শক্তি বা রাষ্ট্রের জনগণ যদি তাদের বলয়ের বাইরে যাওয়ার করার ইচ্ছা করত, তাদেরকেই তারা হত্যা ও ধ্বংস করে দিত।

পরমাণু অস্ত্র আর প্রচলিত অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় হলো। সেই সময় সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ইচ্ছা করল, ইউরোপ-অ্যামেরিকাকে একটি কঠিন আঘাত করবে। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রোলের মজুদ ছিল না। এর ফলে তাদেরকে আরব বিশ্বের পেট্রোল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের পেট্রোলের উপর নির্ভর করতে হতো। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের কৌশল ছিল, প্রথমেই আরব বিশ্বকে দখল করে নেওয়া।

এটা এমন একটি স্বপ্ন, যা মস্কোর নেতারা অনেক আগে থেকেই দেখে আসছিল। আরবে তেল আবিষ্কার হবার আগে তাদের লক্ষ্য ছিল আরব উপদ্বীপের উষ্ণ পানির উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা রাশিয়ার উত্তর দিকের পানির উৎসগুলো দুই মাসের অধিক সময় ব্যবহার করা যেত না। যখন শীতকাল চলে আসত, তখন এই সমুদ্র বরফে পরিণত হয়ে যেত। তাই রাশিয়ার স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ ছিল আরবের উষ্ণ পানির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করা।

পূর্ব-পশ্চিমের এ প্রতিযোগিতা ও পেট্রোল আবিষ্কারের পর, ব্রেজনেভ আরব ও তার তেল ক্ষেত্রগুলো দখলের মাধ্যমে ইউরোপ আমেরিকার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা করে। আর এই স্বার্থ থেকেই আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। তাই আফগানিস্তান ছিল অন্য বড় একটি স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম। আফগানিস্তান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে থাকা ইসলামী রাষ্ট্র গুলোতে আসা-যাওয়ার পথ। তারা প্রথমে আফগানিস্তান দখল করবে এরপর আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করবে, এভাবে পুরো আরববিশ্বকে দখল করে নেবে এবং সেই সমস্ত ছোট রাষ্ট্রের জনগণকে গুম, হত্যা করতে শুরু করবে। এটাই তাদের পরিকল্পনা ছিল। তারা কুয়েত থেকে শুরু করে ওমান পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাবে ভেবেছিল।

তখন আমেরিকার হাতে শুধু আরব উপদ্বীপের দেশগুলো ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্র ছিল না। এমনকি মিশরের আব্দুল নাসের পর্যন্ত সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামিআ আজহারের প্রধান মুফতি বলেছিল- ‘সমাজতন্ত্র ইসলামেরই অংশ’।

এটা ছিল তার উপর আব্দুল নাসের এর চাপের ফল। এমনকি সুদানের শাসক জাফর পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেয়।

পুরো আরববিশ্ব সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঠিক সেই সময় যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন রাজনীতিবিদ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন লোকেরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল দখল করা। কারণ আফগানের শুষ্ক মরুভূমি বা রুক্ষ পাহাড়ে তাদের আশার কিছুই নেই।

আর এই কারণেই ১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করে, যদিও তার মধ্যে ভয় কাজ করছিল। কারণ এ অঞ্চলে রাশিয়াকে প্রতিহত করার মতো তাদের কোনো সহযোগী ছিলো না। মার্কিনীরা উপসাগরের প্রভাবশালী নেতা ইরানের বাদশাহর উপর কিছুটা ভরসা করত। কিন্তু ইরান-বিপ্লব এসে তাদের সে ভরসাও শেষ করে দেয়। তখন তারা ইরানের বাদশাহ থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়। এমনকি তারা তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়টুকুও দেয়নি।

ইরানের বাদশাহর পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বর্তমানে আরব উপদ্বীপে যারা নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করছে, তারা মূলত উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। যা ধর্মীয় কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের দ্বীন কোনো অবস্থাতেই এ কাজের বৈধতা দেয় না। বরং তারা মুসলিম দেশগুলো কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে আঁতাত করেছে। যুদ্ধরত কাফেরদেরকে সাহায্য করছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অন্যদিকে চিন্তাগত দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা সঠিক নয়, কেননা ইহুদী-নাসারা হচ্ছে এই উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু। তারা মুসলিমদের কোনো অঞ্চলে আসে একমাত্র ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, মুসলিমদেরকে নির্যাতন এবং তাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য।

বালুচিস্তানের কোয়েটা থেকে ওমান পর্যন্ত যতগুলো শহর বা গ্রাম অতিক্রম করা হতো, অত্যন্ত আফসোসের সাথে প্রত্যেকটি স্থানে কমিুনিষ্ট পার্টির লাল পতাকা উড়তে দেখা যেত। তারা অধিকাংশ শহর ও গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। এমনকি সেখানের প্রতিটি গোত্রের বৈঠকখানাগুলোতে কার্ল মার্মকস, লেলিন ও স্টালিনের ছবি দেখা যেত। বালুচ কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেক বছর ২৭ ডিসেম্বর সারা দেশে জনসমাবেশ করত। এটা ছিল রাশিয়ান বাহিনীর আফগানে প্রবেশের দিন। তারা সেদিন বিশাল আকারে অনুষ্ঠান করত, যাতে কমিউনিস্ট পার্টি এসে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়। সুতরাং সেখানে কোনো প্রতিরোধ ছিল না। বরং রুশ বাহিনীকে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল। আরব উপদ্বীপ দখল করা, তাদের নেতাদেরকে গুম করা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের মাঝে কোনো বাধাই তখন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আফগানের মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন। ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে শেষ যুগের সবচেয়ে বড় আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। যেই যুদ্ধ তাদের দেশকে তছনছ করে দিয়েছে, সন্তানদেরকে এতিম করে দিয়েছে, নারীদেরকে বিধবা বানিয়েছে, ঘর-বাড়ি ও শহরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা এই যুদ্ধে অগণিত মুজাহিদ প্রেরণ করেছে এবং বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে।

সুতরাং এই ছিল আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের পূর্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা। তাদের চেষ্টা ছিল ইসলামী বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং ওহি নাযিলের ভূমি জাযিরাতুল আরবে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উম্মাহর এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাশিয়াকে প্রতিহত করেছেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখি, তিনি যেন তাদের নিহতদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন, আহতদেরকে সুস্থ করে দেন, এতিম ও বিধবাদেরকে সাহায্য করেন, নিশ্চয় তিনি উত্তম অভিভাবক ও সর্বক্ষমতার অধিকারী।

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে স্পষ্ট কুফরের দিকে আহ্বান করতে শুরু করে। তখন তাদের সামনে কিছু আলেম ও যুবক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ছিল অনেক স্বল্প। এতটাই স্বল্প যে, তারা একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিল তাদের কাজের অফিস হিসেবে, সেখানে তারা মিটিং সম্পন্ন করত। কিন্তু একমাসের বেশি সে ঘরের ভাড়া দিতে না পারায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা কিছু মুজাহিদ নেতাকে সে সময় সাহায্য করলেন। তাঁরা কমিউনিস্ট পতাকা ছুড়ে ফেললেন। তাঁদের প্রতি আমাদের ইনসাফ করা চাই, তাঁদের যথাযথ সম্মান করা চাই। কারণ তাঁদের কারো কারো বিরাট কুরবানী রয়েছে। পরে যদিও কারও কারও পদস্খলন ঘটেছিল।

অতঃপর যখন রাশিয়া আফগান থেকে বের হয়ে গেল, দুঃখজনকভাবে তারা ইখতিলাফ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেল, যা ছিল আরও বেশি ক্ষতিকর। আমি আপনাদেরকে এই কথাটা বারবার বলেছি, এই দ্বীন কখনো ইখতিলাফ ও অনৈক্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কখনো হয়তো শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু ইখতিলাফের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যাই হোক, এক সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর দয়া করলেন। ফলে তারা এমন একজন ব্যক্তির অধীনে একত্রিত হয়ে গেল, যিনি আফগানিস্তানের ভেতরে বা বাইরে কোথাও তেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু একত্রিত হওয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করলেন।

তারা আফগানিস্তানে ৯৫% এর বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সোভিয়েত জোটের প্রেসিডেন্ট ছিল ব্রেজনেভ। সে খনিজ তেল দখল করার মাধ্যমে ইউরোপের টুঁটি চেপে ধরার উদ্ধত খাহেশ লালন করেছিল। আর এটা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সরাসরি আক্রমণ করে বসে। এটা ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। সাধারণ জনগণ যখন রাশিয়ান সেনা দেখতে পেল, তখন তাদের ভুল ভাঙল। তারা বুঝতে পারল যে, এটা ইসলামের উপর আঘাত, এটা কুফরী শক্তির আক্রমণ। ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই জাতি লাল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

আলেমদের ফতোয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সময় আফগানের বড় বড় আলেমরা ফতোয়া দিয়েছেন, যাদের মধ্যে ছিলেন শাইখ ইউনুস খালিস রহ., শাইখ জালালউদ্দিন হাক্কানী। আল্লাহ তাঁদের সমস্ত আমল কবুল করুন।

এই ফতোয়ার পর আফগানিস্তানের সর্বত্র জিহাদের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। শুরু হয় সশস্ত্র লড়াই। গোত্রগুলো আনন্দিত হয়ে যায়, তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে এবং শহীদদের রক্ত দ্বারা নতুন করে ইতিহাস লেখা শুরু হয়।

এই যুদ্ধটা এমন একটা সময়ে শুরু হয়, যখন পুরো বিশ্ব রুশশক্তির সামনে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকেও গোপন করার চেষ্টা করছিল। এই দুরবস্থার মধ্যেই ১৯৮০ সালের ২০ শে জানুয়ারি জিমি কার্টার মিডিয়াতে এসে ঘোষণা দেয়,

> *'নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরব উপদ্বীপের দখল নিতে দেবে না।' এ সমস্ত কাফেররা আমাদের সম্পদ নিয়ে, আমাদের রাষ্ট্র নিয়ে এবং আমাদের সমুদ্র নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। সে বলল, 'আমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশের অনুমতি দিবো না এবং বাধ্য হলে আমেরিকা খুব শীঘ্রই তাদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে।'*

অথচ বাস্তবে এই হুমকি ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই ছিল না। কারণ সেই অঞ্চলে ইরানের শাহের পতনের পর তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো শক্তির অস্তিত্বই ছিল না এবং সেই অঞ্চল পুরোটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল।

যদি আফগানীদের জিহাদে আল্লাহ তাআলার সাহায্য না থাকতো, তাহলে আরব উপদ্বীপ আল্লাহর শত্রুদের হাতে চলে যেত। তারা সেখানে সমাজতন্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। তাদের অবস্থা সেই সময়ের দক্ষিণ ইয়েমেনের অবস্থার মতোই হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এবং এই দ্বীনের উপর থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ করার তাওফীক দিয়েছেন।

রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশের সাথে সাথেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদেরকে একত্রিত করে ফেলে। কারণ আফগান পতনের পর তাদের উপর হামলা হবার আশঙ্কা ছিল। পাকিস্তান তখন একটা সাঁড়াশি জালে আটকা পড়ে যায়, কারণ রাশিয়া ও ভারতের মাঝে মৈত্রী চুক্তি ছিল, এর ফল হচ্ছে অবশ্যই পাকিস্তানকে দখল করে নেওয়া হবে। তাই পাকিস্তানের নেতা ও কমান্ডাররা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার পথ বের করতে বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিলো প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে। এছাড়া সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে এবং তা জমা করার জন্য কেমন সময় তাদের হাতে রয়েছে, তাও সেই বৈঠকের আলোচনায় ছিল।

তাদের তো ভারতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ জয়ের সক্ষমতা নেই, এই অবস্থায় যদি রাশিয়া পেছন থেকে আক্রমণ করে, তাহলে অবস্থা কতটা

ভয়াবহ হবে! তাদের মধ্যে একজন বলল, আফগানিস্তান এক সপ্তাহের বেশি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। তারা পরাজিত হবে, যেমনিভাবে রোমানিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পতন হয়েছে। তাদের মাঝে যারা অধিক বিচক্ষণ ছিলো, তারা বললো- আফগানের মুসলিমরা দুই মাসের মতো রাশিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টা পুরো বিশ্ব কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা ছাড়া একদম নিশ্চুপ বসে ছিল। আরব দেশগুলো একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি, যদিও তারা স্পষ্টভাবেই জানত এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র তারাই।

দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তারা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বোঝার জন্য কিছু লোক প্রেরণ করে। তারা এসে দেখতে পেল আফগানীদের মানসিকতা অনেক অনেক উঁচু। তারা গরিব, তারা দুর্বল, তারা খালি পা, তাদের পেটে খাবার নেই, কিন্তু তা স্বত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার উপর তাদের বিশ্বাস ও ভরসা প্রচণ্ড। আর তাদের কাছে ছিল সেই সমস্ত বন্দুক, যা দিয়ে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। সেগুলো ছিল অনেক পুরাতন বন্দুক। আফগানী নিজের বকরিকে বিক্রি করে দিচ্ছিল এই পুরাতন অস্ত্রের বুলেট কেনার জন্য।

পরিদর্শকরা এই খবর সেই সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছালো। যখন পশ্চিমা দেশগুলো দেখলো যে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানীদের পর্যাপ্ত হিম্মত রয়েছে, তখন তারা তাদের অনুগত শাসক ও মিত্রশক্তিকে আফগানীদের সাহায্যের আদেশ দিল। এরপর তারাও সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। রাশিয়ার বিশাল শক্তির প্রতি প্রচণ্ড ভীতির কারণে আমেরিকা, ইউরোপ ও আরব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা দেখতে পাচ্ছিল না উম্মাহর মধ্যে পুনরায় জিহাদের চেতনা জাগ্রত করার ফলে তাদের উপর কী ধরনের বিপদ আসতে পারে। বরং তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাশিয়ান হিংস্র ভাল্লুককে যেকোনো মূল্যে আটকানো। যে কিনা পুরো বিশ্বকে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

এই চরম ভয়-ভীতি ও রাশিয়াকে যেকোনো মূল্যে আটকানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের সামনে সমস্ত দরজা খুলে যায়। অতঃপর যুদ্ধ তার ফলাফল প্রকাশ করল এবং সোভিয়েত জোট ভেঙ্গে গেল। সেই সময় আমেরিকা ও তাদের কর্মকর্তারা উম্মাহর মধ্যে এই বরকতময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জিহাদের প্রভাব দেখতে পায়। সোভিয়েত জোটের শক্তির কি বিশাল ক্ষতি হয়েছিল, তা দুনিয়ার জানা আছে। তারা পরবর্তীতে স্বীকার করেছিল যে, আফগান যুদ্ধে তাদের ব্যয় হয়েছিল ৭০ মিলিয়ন ডলার।

এই যুদ্ধের পর সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ আফগান থেকে জরুরি ভিত্তিতে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। তখন সোভিয়েত জোটের প্রচণ্ড ভয়ে সাধারণ-বিশেষ কেউই বিশ্বাস করত না যে, আফগানরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। উম্মাহর মধ্যে রাশিয়ানদের ভয় উপর থেকে নিচ সবাইকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আফগানে হিজরতের সময় শায়খরা যোদ্ধাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সান্ত্বনা দিতেন। তারা বলতেন, রাশিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি আরো অনেক কথা। কিন্তু যখন সোভিয়েত জোট চলে যাওয়ার খবর প্রচারিত হলো, মানুষেরা অন্ধবিশ্বাসের কারণে তা মেনে নিতে পারছিল না। অনেক সৎ ব্যক্তিরাও বলেছিলেন- আফগান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনেক স্বার্থ রয়েছে। অন্যথায় তারা ২৪ ঘণ্টার ভেতরেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে পারে!

গর্বাচেভ যখন বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সোভিয়েত জোটের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা বলে- ‘যদি আমরা আফগান থেকে সরে আসি, তাহলে তা হবে বৈশ্বিক কমিউনিজম, সোভিয়েত জোট ও রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশাল একটি পরাজয় ও লাঞ্ছনা। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা আবশ্যক।’ সে তাদেরকে বলল, ‘বিষয়টা এর থেকেও বড়। এই মুহূর্তে সোভিয়েত জোটের ভাণ্ডারে তোমাদের সন্তানদের জন্য দুধ ক্রয়ের টাকাও অবশিষ্ট নেই।’

আফগান যুদ্ধ সোভিয়েত জোটকে আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। সেই সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় সোভিয়েতের অভ্যন্তরেও অনেকগুলো কারণ তৈরি হয়, যা তাদেরকে ভঙ্গুর করে দেয়।

আর এই মহান যুদ্ধটা ছিল তৃতীয় আঘাত, আল্লাহর ইচ্ছায় যা তাদের মেরুদন্ডকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তারা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে প্রবেশ করে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বের হয়ে যায়। প্রায় দশ বছর তারা আফগান দখলে রেখেছিল। তারা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আফগানে প্রবেশ করে।

আল্লাহর ইচ্ছায় দশ বছর পর ১৯৮৯ সালের সেই সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর একসাথে পুরা বিশ্বের দূতাবাস থেকে সোভিয়েতের পতাকা নামিয়ে ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলা হয়। সোভিয়েত জোটের প্রভাব বিলুপ্তির পর সে স্থানে রাশিয়ার পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরা-টুকরা হয়ে যায়। তাদের জোট থেকে ১৫টি রাষ্ট্র বের হয়ে যায়। আর এভাবেই বিশ্ব থেকে কমিউনিজম নামক শয়তানী আদর্শের বিলুপ্তি ঘটে।

??????????? ????: ?????????!

ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ছিল জর্জ বুশ। সে সময় ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক সমমনাদের নিয়ে গঠিত থিঙ্কট্যাঙ্কের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়েছিল “নতুন মার্কিন-শতাব্দী প্রকল্প” (Project for the New American Century-PNAC) ।

এই প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয় একবিংশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একক সাম্রাজ্য সৃষ্টির। যে সাম্রাজ্যে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী থাকবে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই হবে জাতিসংঘের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। কোনো উন্নত শিল্পায়িত দেশেরও আঞ্চলিক অথবা বৈশ্বিক পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। এই প্রকল্পের কর্তা ব্যক্তিদের অন্যতম ছিল বুশ সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, রিচার্ড পার্ল, পল উলফোউইজ, জর্জ বুশের ভাই জেব বুশ প্রমুখ।

২০০৩-এর ২১ মার্চ (ইরাক আক্রমণের পর দিন) রিচার্ড পার্ল আমেরিকার Enterprise Institude-এ এক ব্রিফিং সেশনে বলে,

> “ইরাক দখলের পর যুদ্ধোত্তর স্বল্পকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, জাতিসংঘের বৈপ্লবিক সংস্কার (যেমন, নিরাপত্তা পরিষদের বাকি রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা কেড়ে নেয়া বা অপসারণ), ইরান ও সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন (regime Change) এবং ফ্রান্স ও জার্মানির প্রতিবাদী জালগুলি ছেঁটে ফেলা।”

এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বৈধতা অথবা নীতি-নৈতিকতাকে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিকরা আমলে আনার কথা চিন্তাও করেনি। বরাবরের মতো মেকিয়াভেলিই হয়েছিল তাদের প্রধান গুরু।

একসময় আফগানিস্তান দখল করে নেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ। তখন Terror Risk Country হিসেবে সন্দেহজনক যে ২৪টি দেশের তালিকা তৈরী হয়, তার মধ্যে উত্তর কোরিয়া ব্যতীত বাকী ২৩টিই রাষ্ট্রই ছিল মুসলিমপ্রধান। বিলিয়নসংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট উম্মাহর সামনে আমেরিকা হাসতে হাসতে মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং এই আচরণের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা দিয়েছে প্রকাশ্য

দিবালোকে। এ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন আর প্রথাগত রাজনীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক সংকট নিরসনের অলীক স্বপ্নের অবাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকা যদি প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন না হতো, (যার ফলাফল ছিল আমেরিকার অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়া এবং বিশ্বের সম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়া) তবে গোটা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর চিত্র কী হতো তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন আরব মুজাহিদদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর উপর ইহসান করতে। আমেরিকার দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের উসিলায়।

ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম ভূমিতে (মোট ৮০টি দেশে এই হীন কর্মসূচী চলমান ছিল) আমেরিকানদের তথাকথিত "ওয়ার অন টেরর" এ মুসলিম প্রতিরোধবাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে:

নিহত হয় ৯ লাখ সৈন্য।

খরচ হয় ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

নষ্ট হয় নিজ দেশের রাজনৈতিক সংহতি।

শেষমেষ, ২০২১-এর আগস্টে আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয় আমেরিকা। ফিরে আসে ইসলামী শাসন। অন্যান্য মুসলিম ভূমিগুলোতে আমেরিকান প্রভাব হয় অনেকটাই বিলুপ্ত। আটলান্টিকের ওপারে আবারো জোর আওয়াজ ওঠে মুনরো ডকট্রিনের আলোকে নিজ মহাদেশের কারবার নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকার। এমনকি ইউরোপেও আমেরিকান আধিপত্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়- রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের মাধ্যমে। আরব বসন্ত, উত্তর কোরিয়া ও চীনের আস্ফালনের কারণে এশিয়াতেও ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে পড়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী ‘পরাক্রমশালী’ আমেরিকা। গোটা দুনিয়াতেই আমেরিকার উঁচু নাক আজ মাটিতে ঘসা খাচ্ছে! আর এই পতনের শুরু ও শেষ রচিত হয় মহান মুজাহিদদের হাতে! ফা লিল্লাহিল হামদ।

দাওয়াতী, রাজনৈতিক ও চিন্তার ময়দানে স্থবিরতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা বাস্তব কোনো পরিবর্তন আনা যে সম্ভব নয়, তার প্রমাণ উম্মাহ দেড় যুগ আগেই পেয়ে গেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন আর প্রথাগত রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের বিজয় যে সম্ভব না—এবিষয়টি কেবল ঐ সকল ব্যক্তিরাই বুঝতে পারছেন না, যাদের আকল ছিনতাই হয়ে গিয়েছে অথবা দুনিয়াপূজার বাইরে যাদের অন্য কোনো চিন্তা নেই। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার সংঘাতের সূত্র আত্মস্থকারী যে কোনো মুসলিমের কাছেই আমেরিকার আগ্রাসী মনোভাবের বাস্তবতা উপলব্ধি করা কঠিন কিছু না। বরং আরও অগ্রসর হয়ে একথাও নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব, ন্যূনতম বোধশক্তি থাকা কোনো ব্যক্তির জন্যেও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নির্মম বাস্তবতা অনুধাবন করা কষ্টকর নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমাদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও নীতিনির্ধারকদের মানসিকতা এডলফ হিটলারের মতো উল্লেখ করে উদ্ধৃত করেছেন Mein Kampf বইয়ের (যা Adolf Hitler এর আত্মজীবনী) ৫৩তম পৃষ্ঠা থেকে নিম্নোক্ত বাক্যটি-

> *“The one means that wins the easiest victory over reason- Terror and force!”*

“যে পদ্ধতি যুক্তির ওপর সবচেয়ে সহজে বিজয়ী হয়, সেটা হলো ‘ত্রাস ও শক্তি’।”

একজন সেক্যুলার যা বুঝতে পেরেছেন, উম্মাহর বহু আন্তরিক সদস্য তা বুঝতে অক্ষম। কতই-না দুঃখজনক!

উম্মাহকে অবশ্যই বুঝতে হবে, মুসলিমদের উপর আমেরিকা ইসরায়েল বা ভারতের আগ্রাসন কখনই সভা-সমিতি, প্রথাগত রাজনীতি বা পত্রিকায় মাধুর্য্যমন্ডিত কলাম লেখার মাধ্যমে বন্ধ হবে না। জনপ্রিয়তা, ভাষার সৌন্দর্য, কল্পনাপ্রসূত “বাস্তবতার দাবী” কিংবা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উম্মাহর জন্য অপরিহার্য।

বাস্তবতা হচ্ছে আমেরিকা, ইসরায়েল বা ভারতের মতো বিশ্ব অপরাধীরা বা তাদের মদদপুষ্ট শাসকগোষ্ঠী যুক্তির ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হবে- এমন কল্পনা কেবল আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তিবর দ্বারাই সম্ভব। আমেরিকা-ইসরায়েল বা ভারতের মতো চিহ্নিত অপরাধী মোড়লদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বত্র প্রতিরোধ, অবরোধ ও আক্রান্ত করার মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তা ও সম্মান ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণঃ কর্তব্যের ডাক

ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকায় আদর্শত্যাগী, প্রতিবিপ্লবী নেতা ও আলেমদের ব্যার্থতার ফলাফল হিসেবে ইসলামী সভ্যতার প্রস্থান ঘটে ১৮শ শতকেই। ১৯২৪ অবধি উসমানীরা কেবল নিজেদের কংকালই বয়ে বেরিয়েছিল। যেকারণে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তাদের বলা হতো The Sick Man of Europe। আসন্ন পতনের ঘনঘটা সত্ত্বেও, সে সময়ের উলামা ও নেতারা সমসাময়িক উলামা ও নেতাদের মতোই আভ্যন্তরীণ কোন্দল আর শাখাগত আলোচনাতেই ছিলেন মশগুল।

যার ফলাফল হিসেবে, ২য় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পতনের পর কিংবা শীতল যুদ্ধে কমিউনিজমের পতন পরেও ইসলাম বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদের দাড় করাতে সক্ষম হয়নি।

এমনই সময়, আল্লাহ তা আলা অনুগ্রহ করলেন! দানবীয় সাম্রাজ্য ও আগ্রাসী, মানবতাবিরোধী সভ্যতার কফিনে পেরেক ঠুকলো আল্লাহ তা আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারাই! তিন যুগ আগে '৮০ এর দশকে আফগানিস্তানের পাহাড়ে সমাধি রচিত হলো সোভিয়েত রাশিয়ার। দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হলো কমিউনিজম নামক ভয়ংকর সভ্যতার!

অতঃপর, শীতল যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন গোটা দুনিয়াতে আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত লিবারেল পশ্চিমা দুনিয়ার একক আধিপত্য কায়েম হলো, তখন- স্থবিরতা ভেঙ্গে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গোটা দুনিয়াতে শায়খ আবু আব্দুল্লাহ, শায়খ আইমান, শায়খ আবু ইয়াহইয়া, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ ও শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াযিদদের মতো মহান ব্যাক্তিরা ফিকরি, ইলমি ও সাংগঠনিক মেহনতের বিরল নজির পেশ করলেন।

দোর্দন্ড প্রতাপশালী, নিযুত-কোটি সেনার নেতা হিটলার-মুসোলিনি যা পারেনি, ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ যা পারেনি- ঠিক তা ই করে দেখালেন ইমাম উসামা রহ.! পশ্চিমা লিবারেল সভ্যতার পতনের মঞ্চ প্রস্তুত করেই শুধু থামলেন না, এমন এক দাওয়াত ও বিপ্লবী প্রজন্ম রেখে গেলেন, যারা আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানে অগ্রসরমান।

উম্মতের এই মহান ব্যাক্তিরা আল্লাহর ইচ্ছায় ত্রিশ বছর আগেই আমেরিকা ও ইউরোপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাবস্থার স্বরূপ ও করণীয় তুলে

ধরেছেন, যার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতা আমাদের সামনেই উপস্থিত। অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াতে কাংখিত ইসলামী আন্দোলন দাড় করানো হলো; যা তাওহিদি সভ্যতার প্রত্যাবর্তনের কল্পনাকে বাস্তবতায় পরিণত করতে চলেছে!

লক্ষ্য করুন, আমাদের ইমামদের কথার রেজোনেন্স হিসেবে একই কথা মাত্র অল্প কিছুদিন আগে আলেক্সান্দার ডুগিন ও অ্যালাইন সোরালরা বলা শুরু করেছে-

> *"The primary target must be Western postmodernism: we must wage war upon this thalassocratic Empire — a morbid blend of the society of the spectacle and consumer culture — and its plan for ultimate world domination.*
>
> *Dugin shows that the only way to build a multipolar world, founded on authentic values, is to resolutely turn one's back on the Atlanticist West and its false values.*
>
> *And how can this be achieved? Only by unconditionally preserving the geopolitical sovereignty of the powers of the Eurasian continent — Russia, China, Iran and India — which safeguard the freedom of all other peoples on the planet."*

অর্থাৎ,

> *"প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা পোস্ট-মডার্নিজম (চলমান লিবারেল দর্শন, যা প্রগতির ফলাফল) । সমুদ্রের মতো গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করতে উদ্যত ভোগবাদি ও অসুস্থ এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে।*
>
> *দুগিন দেখিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে সঠিক মূল্যবোধের উপর একটি মাল্টিপোলার দুনিয়া গড়ে তুলতে অবশ্যই ইউরো-আমেরিকান বাতিল মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।*
>
> *আর কিভাবে তা অর্জিত হবে? তা হবে, নিঃশর্তভাবে ইউরো-এশিয়ান মহাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার মাধ্যমে। তথা- রাশিয়া, চীন, ইরান ও ভারতের (আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে) কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা গেলে এগ্রহের মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।"*

'পশ্চিমা লিবারেল সভ্যতার প্রতিস্থাপক হিসেবে ইউরোএশিয়ান সভ্যতা ফিরিয়ে আনা'র তত্ত্বের ফলাফল হিসেবেই- রাশিয়ার ক্রিমিয়া annexation, সিরিয়া আক্রমণ, কাজাখস্তানের বিদ্রোহ দমন এবং সর্বশেষ ইউক্রেন অভিযান। পাশাপাশি দেখতে পাই, চীন কর্তৃক হংকং এর গণতান্ত্রিক বিদ্রোহের নির্মম প্রশমন!! আবার দেখা যাচ্ছে চীন-রাশিয়ার মদদপুষ্ট রাফেজি ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মিলিশিয়া ও অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাববলয় বিস্তারে অগ্রসরমান।

এবং ভারত দক্ষিণ এশিয়াতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরো বিস্তার ও সুসংহত করতে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সামরিক-রাজনৈতিক চেষ্টা জারি রেখেছে।

অথচ *এই বাস্তবতা ইসলামের নেতারা কত সরলভাবেই বারবার বলে আসছেন-*

"বড় বড় শকিত বা সাম্রাজ্যের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই একটি চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আপনি চাইলে ইতিহাস দেখতে পারেন। একেষত্রে আমেরিকার ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। মাত্র ছয় দশকে এই দেশটি কয়েক ডজন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কারণ তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য যেসকল বিষয় প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আন্তরিক সিদ্ধান্ত নিবে, সেদিনের আগেই তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের সাম্রাজ্যবাদের পতন শুরু হলো। আল্লাহর ইচ্ছায় সামনে এমন-ই হবে। (ইতিমধ্যে তা হয়েছে। লেখাটি দশ বছর আগের)

তাই শান্তিচুক্তির সকল আহবানের ব্যাপারে সদা সর্তক থাকুন। কারণ এটি আসলে আমাদেরকে হতাশ করার ও আত্মসমর্পণ করার আমন্ত্রণ। আর মূর্খ ও মুনাফিক ব্যতিত অন্য কেউ এজাতীয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করে না।"

- শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল লিব্বি রহ. ।

সার্বজনীন বাস্তবতা হিসেবে ভবিষ্যতে তাই তিনটি সভ্যতায় দুনিয়ার বিভাজন প্রায় অনিবার্য-

১) লিবারেল বিশ্ব- যার প্রভাব সামান্য পরিসরে বাকি থাকবে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে। তথা, লিবারেল পশ্চিমা সভ্যতা।

২) কনজার্ভেটিভ বিশ্ব- যার প্রভাব রাশিয়া-চীন-ভারতের বদৌলতে বজায় থাকবে পূর্ব ইউরোপ এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াতে। তথা, ইউরোএশিয়ান সভ্যতা।

৩) ইসলামী বিশ্ব- যার প্রভাব থাকবে ইসলামী অগ্রবাহিনী নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতে। তথা, ইসলামী সভ্যতা।

আল্লাহর ইচ্ছায় আফ্রিকায় আহলুস সুন্নাহর অগ্রবাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় সন্নিকটেই। আলহামদুলিল্লাহ এখানে মুসলিমরা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীই বলা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোএশিয়ান সভ্যতার পতাকাবাহী ইরানকে রুখে দিতে ইয়েমেন ও সিরিয়াতে মুসলিমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। ইরাকের অবস্থা নিশ্চিত নয়। মধ্য এশিয়াতে আফগানিস্তান আশানুরূপ ফল না আনতে পারলেও, চীনের মোকাবিলায় তাদের সুসংহত অবস্থান কাম্য।

আর, দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের মোকাবিলায় কাশ্মির ও পাকিস্তানের বিপ্লবীদের কাংখিত সফলতা পাওয়া না গেলেও আশা করার সুযোগ থাকলেও, এক্ষেত্রে সমীকরণ বদলে দিতে মূল ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা!

লক্ষ্য করুন! এখন ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কেবল নিজ দেশে কিছু দীনি মূল্যবোধ জাগ্রত করা না। বা সংসদে কিছু আসন ব্যবস্থা করাও না। অথবা, ক্ষমতা চর্চা করাও না!! বরং, এখন ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লবী মেহনত হবে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানে ভূমিকা রাখতে! আর সংকীর্ণ লক্ষ্য, অপ্রস্তুত চিন্তাকাঠামো কিংবা গতানুগতিক ধ্যানধারণা নিয়ে এই মহান অর্জন সম্ভব নয়!

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা ইসলামী সভ্যতা বিনির্মানে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে আগ্রহী কি না? আমাদের ভূমির মুসলিমরা আবারো আগের ন্যায় ইউরোপীয় বা ইউরোএশিয়ান সভ্যতার শক্তিশালীকরণে লেজুড়বৃত্তি করবে, না প্রথমবারের মতো ইসলামী সভ্যতার বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে!!? নাকি, এবারও আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার সংগ্রামে শরিক হওয়া থেকে দূরে থাকব? পশ্চিমাদের পরানো জিঞ্জির আর বেড়ি খুলে ফেলতে জাতিকে সাহায্য করা থেকে বিরত থেকে পরবর্তী

প্রজন্মকেও গোলামীর জন্য প্রস্তুত করব!?!

নিঃসন্দেহে ইউরোএশিয়ান ডানপন্থী কনজার্ভেটিভ বা পশ্চিমাপন্থী লিবারেল বামপন্থী শক্তির লেজুড়বৃত্তিতে মত্ত, আত্মপরিচয় সংকটে ভুগতে থাকা আপসকামী ভীতু অথবা গৎবাঁধা স্থবির সাংগঠনিক কাজে ব্যস্তদের পক্ষে ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।

একইভাবে বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসিজম আর শীতল যুদ্ধের পর কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামী উত্থানের সম্ভাবনা যাদের হাতে ইতিপূর্বে ধূলিসাৎ হয়েছে, তাদের পক্ষে লিবারেল দুনিয়ার পতনের এই সময়েও ইসলামী জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া সম্ভব হবে না, বলাই বাহুল্য!

এলক্ষ্যে বিপ্লবীদের চিন্তা, মানহাজ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। পাশাপাশি, প্রতিবিপ্লবীদের চিহ্নিত ও বর্জন করাও অপরিহার্য।

সভ্যতার উত্থান-পতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে, আসন্ন ইসলামী বিপ্লব সফল করতে তাই মেধা, শ্রম, শক্তি ও সময়ের সর্বস্ব নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার বিকল্প নেই!! কারণ,

We Have A World To Win!

And Nothing To Lose But Chains!

আল্লাহ তা আলা তাওফিক দিন।